২য় পর্ব
দ্বীন কায়েম
একটি কৌশলগত পর্যালোচনা
الحكمة
আল হিকমাহ মিডিয়া
আবু আনওয়ার আল হিন্দি
(হাফিজাহুল্লাহ)

দ্বীন কায়েম

একটি কৌশলগত পর্যালোচনা

২য় পর্ব

আবু আনওয়ার আল হিন্দি (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনায়

আল হিকমাহ মিডিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল গণতন্ত্র, নুসরাহ, কিংবা আগে খিলাফাতের ঘোষণা তারপর বিশ্বব্যাপী জিহাদ- ইত্যাদি বিভিন্ন মানহাজ তথা পদ্ধতির কথা বললেও বাস্তবতা হল, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই শেষ পরিণতি হল দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। এ গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বড়জোর আঞ্চলিক ইমারাহ গঠন সম্ভব এবং নিয়ন্ত্রানাধীন জায়গায় শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু কোন ভাবেই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব গ্রহণ, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলিমদের সকলকে সাহায্য করা এবং দখলকৃত সকল মুসলিম ভূমি মুক্ত করার লক্ষ্যে সকল স্থানে জিহাদ করতে সক্ষম এরকম একটি কেন্দ্রীয় খিলাফাহ গঠন করা সম্ভব না। বর্তমানে ইসলামের জন্য মুজাহিদিন [যাদেরকে পশ্চিমা ও তাদের তোতাপাখিরা “সন্ত্রাসী” বলে] ছাড়া আর কেউ জিহাদ করছে না। মুসলিম ভূমিগুলোর উপর মুরতাদ-ত্বওয়াগীত শাসকগোষ্ঠী কুফফারের সহায়তায় জেঁকে বসে আছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কুফফার এবং মুসলিম তথা মুজাহিদিনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে এবং সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের সাধারণ জনগণ তাদের ফরয জিহাদের দায়িত্ব, খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং নির্যাতিত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর কিংবা গাফেল হয়ে আছে। উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবার এবং দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসকারী এই বিপদজনক শীতনিদ্রা জাগাবার গুরুদায়িত্ব পালন যাদের করার কথা, সেই উলেমাগণের অধিকাংশই এই দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। এই বিবিধ কারণে মুজাহিদিন এবং কুফফারের শক্তির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। লোকবল, প্রযুক্তি, অর্থ এবং অস্ত্র কোন দিক দিয়েই মুজাহিদিনের অবস্থা কুফফারের এক-দশমাংশও নয়। এছাড়া কুফফারের এমন একটি অস্ত্র রয়েছে যার প্রতিউত্তর দেয়ার কোন উপায় মুজাহিদিনের নেই। আর তা হল এরিয়াল বম্বিং বা বিমানহামলা।

এ পর্যায়ে কোন ভাই প্রশ্ন করতে পারেন, “কেন আমরা দুনিয়াবী হিসেব-নিকেশের জন্য আল্লাহর দেয়া খিলাফা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবো না? আমাদের কি দুনিয়াবি হিসেব-নিকেশ ছেড়ে তাওয়ায়ক্কুল করা উচিৎ না?”

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো – অবশ্যই সাহায্য ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। এবং আমাদের সাধ্য যতোই কম হোক, আল্লাহ্‌ যা আমাদের উপর ফরয করেছেন সেই কাজ কখনোই ত্যাগ করা যাবে না। যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে নেমে যেতে হবে। একথার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত পোষণ করি। আর মুজাহিদিনরা এই কাজই করে আসছেন। আফগানিস্তানে অ্যামেরিকা এসেছিলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে,

কিন্তু ৫০ বছর আগের কোরিয়া যুদ্ধের আমলের একে-৪৭ হাতে, ইস্তেশহাদী বেল্ট পরিহিত, মৃত্যুকে জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসা মুসলিম তরুনদের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমাদের এও মনে রাখতে হবে শারীয়াহর আহকাম, মাস'আলা এবং পরিভাষাগুলো নিছক কিছু শব্দ বা বুলির সমাহার না। এগুলো হল কিছু নির্দিষ্ট ধারণা, যেগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট বাস্তবতা আছে। খিলাফাহ একটি ধারণা যার একটি বাস্তবতা আছে। যদি চার ফিট বাই চার ফিট একটি কামরাকে ঈদগাহ ময়দান ঘোষণা করে কেউ বলে, এখানে পুরো গ্রামের ২ লাখ মানুষের ঈদের সালাত আদায় করা হবে- তবে সেটা বাস্তবতা বিবর্জিত একটি ঘোষণা। একইভাবে একটি ভুখন্ডের উপর সাময়িক তামক্বীন অর্জন করে যদি বলা হয় এটা খিলাফাহ যা সমগ্র মুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণ করছে – তখন সেটাও বাস্তবতা বিবর্জিত। একারণে খিলাফাহ আমরা তখনই ঘোষণা করতে পারি, যখন আমরা খিলাফাহর উপর শার'ঈ ভাবে যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো পালন করতে পারি। অন্যথায় মৌখিক ঘোষণার কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সক্ষমতা অর্জিত না হবে ততক্ষণ মুজাহিদিনের দায়িত্ব হল জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শারীয়াহর মাধ্যমে শাসন করা। এটা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণার মাধ্যমে – যেমন ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তান, ইমারাতে কাভকায। কিংবা হতে পারে ইমারাহ ঘোষণা ছাড়াই, যেমন আল-শাবাব, AQAP, AQIM ইত্যাদি করছে।

উসামার মানহাজঃ

আমরা কেন "উসামার মানহাজ" বলছি? কেন জিহাদের মানহাজ কিংবা আল-ক্বাইদার মানহাজ বা অন্য কিছু বলছি না? এটি একটি সংগত প্রশ্ন। কারণ আমরা জানি জিহাদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, দল বা সময়ের উপর নির্ভরশীল না। জিহাদ বলবৎ থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। তাহলে কেন আমরা "উসামার মানহাজ" নিয়ে এতো আলোচনা করছি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ ছিল মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর একটি নি'আমত। হ্যা, একথা সত্য লাখো আফগান এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্ত এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ কয়েক শো বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের একটি পশ্চিমা পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন। এবং আফগানিস্তানের মাটি থেকেই বৈশ্বিক জিহাদের সূচনা হয়েছে। আফগানিস্তানের জিহাদের আগে, তানজীম আল-ক্বাইদা গঠনের আগে কি জিহাদ ছিল না? অবশ্যই ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক জিহাদি সংগঠন জিহাদের কাজ করছিল যেমন, মিশরের জামাহ ইসলামিয়্যাহ, আল-জিহাদ, লিবিয়ার এলএফআইজি, সিরিয়ার শায়খ মারওয়ান হাদীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত মুসলিম

ব্রাদারহুডের সশস্ত্র অংশ, আলজেরিয়া এবং ইয়েমেনের কিছু ছোট ছোট জামা'আ। কিন্তু এ প্রতিটি জিহাদি জামা'আর উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক। তারা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ত্বগুতকে উৎখাত করে শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছিলেন। এই জামা'আগুলোর কোন বৈশ্বিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছিলেন। একই সাথে জাতীয়তা, আক্বীদা, মাযহাব-মাসালাগত উন্নাসিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা এসব জামা'আর মধ্যে ছিল। এই ধারণায় প্রথম যে ব্যক্তি পরিবর্তন আনেন, তিনি হলেন শায়খুল মুজাহিদিন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র ও স্বল্পমেয়াদী আঞ্চলিক উদ্দেশ্যের বদলে মুজাহিদিনের ধ্যানধারণায় একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামো তৈরি করেন। আফগান জিহাদের শেষ দিকে যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম এবং তার অনুগত আরব মুজাহিদিনের একটি অংশ জিহাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ফিরাস আস সুরি, শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি, শায়খ আবু খালিদ আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ আতেফ রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ সাইফ আল আদল, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি [আনওয়ার সাদাতের হত্যাকারী মহান বীর খালেদ ইসলামবুলির ভাই], শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি এবং অন্যান্য আরো অনেকে। এসব বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন। ১) মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের একমাত্র পথ – জিহাদ, ২) আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু ২ নম্বর বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্নমত ছিল।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের চিন্তা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদিনের একটি ঘাঁটি তৈরি করা, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষন গ্রহণ করতে পারবে, এবং তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এবং মুসলিম বিশ্বের যেখানেই মুসলিম নির্যাতিত হবে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে, এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন সেখানে গিয়ে মুসলিমদের সহায়তায় জিহাদ করবেন। আল-ক্বাইদা [শাব্দিক ভাবে যার অর্থ হল "ঘাটি/ভিত্তি"] নামটির উৎস শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামই।

আল-জিহাদ এবং জামা'আ ইসলামিয়্যার মিশরীয় মুজাহিদিনের চিন্তা ছিল মিশরের মুজাহিদিনকে আফগানিস্তানের মাটিতে মিশরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষন দেয়া এবং একটি অগ্রবর্তী বাহিনী তৈরি করা। জিহাদের মাধ্যমে মিশরের ক্ষমতা দখল করা, তারপর মিশরকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার

করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদিনের একইরকম পরিকল্পনা ছিল নিজ নিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন । শায়খ মতব্যক্ত করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব থেকে আসা মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদী বিভিন্ন জামা'আর সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষন দেয়া হবে। নিজ নিজ ভুখন্ডে জিহাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়া হবে। নিপীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সাথে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে হবে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক ত্বগুতকে উৎখাত করা না। নিছক ভূমি দখল করা না। ইসরাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো না। বরং এই অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উল্টেপাল্টে দেয়া। কুফরের সিংহাসন ভেঙ্গে ফেলা এবং শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান তা কমিয়ে আনা। এবং জিহাদকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা। এবং কুফরের কেন্দ্র, কুফরের পরাশক্তি, এ যুগের হুবাল অ্যামেরিকাকে আঘাত করা।

যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল এমন অবস্থায় পাকিস্তানে এক বোমা বিস্ফোরণে শাইখুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ আযযাম মৃত্যু বরণ করেন। আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখেন, এবং তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আন্তর্জাতিক কুফর মিডিয়া আজো শায়খের পরিচয় দেয়ার সময় তাঁকে "Godfather of global jihad" – বলে আখ্যায়িত করে। যদিও তারা মিথ্যাবাদী, তবে তারা এক্ষেত্রে সত্য বলেছে। এই মহীরুহের শিক্ষা আজো জীবন্ত। আফগান রণাঙ্গনে তার শিক্ষা যতোটুকু উপযুক্ত, কার্যকরী এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল, আজ তিন দশক পর বাংলাদেশ, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের মাটিতেও তা একই রকম কার্যকরী, উপযুক্ত ও সফল। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর, শায়খ উসামা আরব মুজাহিদিনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং আল-ক্বাইদার আমীর নিযুক্ত হন। শায়খ উসামার পরিকল্পনা আল-ক্বাইদার মানহাজ হিসেবে গৃহীত হয়। শায়খ উসামার "সাপের মাথায় আঘাত করা"-র এই পরিকল্পনা নিচে তুলে ধরা হল।

সাপের মাথায় আঘাত কর !

শায়খ উসামার মানহাজকে যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তবে তা হবে এই – "সাপের মাথায় আঘাত কর"। এখানে সাপ দ্বারা বোঝানো হয় বিশ্ব কুফর শক্তিকে। পশ্চিমা কুফর শক্তির আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক শক্তি, ইসরাইল এবং পাশাপাশি মুসলিম

বিশ্বে কুফফারের দালাল শাসকগোষ্ঠী, এই ত্বওয়াগীত শাসকগোষ্ঠীর অনুগত মুসলিম দেশগুলোর সামরিক বাহিনী – এ সবকিছুর সমন্বয়ে, সম্মিলিত বিশ্ব কুফর শক্তি হল একটি বিশালদেহী বিষাক্ত সাপের মত। আর এই সাপের মাথা হল অ্যামেরিকা। সাপের বিষ থাকে সাপের মাথায়। তাই সবচেয়ে দ্রুত, সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয়ে যদি কেউ সাপকে হত্যা করতে চায়, তাহলে তার উচিৎ হবে সাপের মাথা কেটে ফেলা। সাপের মাথা কেটে ফেলা হলে পুরো শরীর নিয়ে অধিক চিন্তার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যদি মাথা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আঘাত করা হয়, সেক্ষেত্রে বিষাক্ত ছোবল থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

ধরা যাক, আমরা মুসলিম বিশ্বের কোন একটি অঞ্চলে ত্বগুতকে উৎখাত করতে চাই। হতে পারে এটা মিশর, কিংবা সাউদী আরব কিংবা বাংলাদেশ। যেমন মিশরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, মুজাহিদিন ত্বগুত আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কি দেখা গেল? সাদাতের জায়গায় অ্যামেরিকা আরেক ত্বগুত, আরেক পুতুল হোসনি মোবারককে বসিয়ে দিল। হুকুমাতকে দুর্বল করা গেল না, শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা গেল না। এর কারণ হল- এই ত্বগুতের পেছনে মূল শক্তি হল অ্যামেরিকা। তাই মূল শক্তিকে না সরিয়ে যতজন সাদাতকেই হত্যা করা হোক না কেন, তাতে অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

একইভাবে যদি আমরা ইসরাইলের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই তারা তাদের তিনদিকে আরব মুসলিমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর অপরদিকে হল সমুদ্র। তারা হল সংখ্যার দিক দিয়ে নগন্য কিছু কাপুরুষ ইহুদী। কিন্তু এরাই দশকের পর দশক পুরো অঞ্চলের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। এটা কি ভাবে সম্ভব? তাদের কোন খনিজ সম্পদ নেই, তারা ব্যাপকভাবে কৃষিপন্য উৎপাদন করে না। তাদের বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি নেই। তাহলে তাদের শক্তির উৎস কি? তাদের শক্তির উৎস হল অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকাই জাতিসংঘ তৈরি করে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা করেছে এবং স্বীকৃতি জোগাড় করেছে। অ্যামেরিকাই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ইসরাইলকে দিচ্ছে। অ্যামেরিকাই ইসরাইলের তিন পাশে থাকা মুসলিম ভূখণ্ডের [জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর] মুরতাদীন শাসকগোষ্ঠীকে লালনপালন করছে, এবং এই শাসকদের মাধ্যমে ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই দেশগুলোর শাসকরা নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, কিন্তু এরা প্রভু অ্যামেরিকাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য, মুজাহিদিনের হামলা থেকে ইসরাইলকে রক্ষা করার জন্য ইসরাইলের সীমানায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শুধু তাই না ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের সর্বশক্তি তারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। তাই ইসরাইলের বাইরে থেকে ইসরাইলে ঢুকে যদি মুজাহিদিন হামলা চালাতে চান, তাহলে প্রথমে এসব অ্যামেরিকার আজ্ঞাবাহী সরকারগুলোকে উৎখাত করতে হবে।

আর যদি অ্যামেরিকাকে দুর্বল না করে সরকারগুলোকে উৎখাত করা হয়, তাহলে পুরনো পুতুলের বদলে নতুন এক পুতুল ক্ষমতায় আসবে। যেমন সাদাতের পর মোবারক এসেছে। মোবারকের পর সিসি এসেছে।

সুতরাং এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের জন্য আগে অ্যামেরিকাকে আঘাত করতে হবে। একবার যদি অ্যামেরিকার মুসলিম বিশ্বে নাক গলানোর ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এসব ত্বওয়াগীতের অপসারণ ইন শা আল্লাহ্‌ সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। একারণে খিলাফাহ ঘোষণা এবং ইসরাইল তথা ইহুদীদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলার আগে অ্যামেরিকাকে দৃশ্যপট থেকে সরানো জরুরি।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে শায়খ উসামা এবং আল-ক্বাইদা তাদের কাজ শুরু করে। পাশাপাশি তারা আঞ্চলিক জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকে, এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আল-ক্বাইদার প্রথম সফল, অফিশিয়াল হামলা ছিল ছিল নাইরোবি ও দারুস সালামে অ্যামেরিকার দূতাবাসে জোড়া বোমা হামলা। এর আগে অ্যামেরিকার সেনাদের লক্ষ্য করে ৯২ সালে ইয়েমেনে হোটেল বোমা হামলা, ৯৩ সালে মোগাদিসুতে আরপিজির মাধ্যমে দুটি ব্ল্যাক হ'ক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার সাথেও আল-ক্বাইদার সম্পৃক্ততা ছিল। নাইরোবি ও দারুস সালামের জোড়া হামলা হয়, ৯৮ সালের অগাস্টে। এর আগে ৯৩ এর ফেব্রুয়ারী মাসে, শায়খ উসামা World Islamic Front for Combat Against the Jews and Crusaders (ইহুদী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বৈশ্বিক ইসলামি ফ্রন্ট) তৈরির ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় শায়খ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ আল-জিহাদের পক্ষ থেকে এবং শায়খ ফাজলুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ হারাকাতুল জিহাদের পক্ষ থেকে সই করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের একত্রিত হয়ে ইহুদী ও ক্রুসেডারদের প্রতি জিহাদের জন্য আহবান করা হয় – এবং পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে অ্যামেরিকাকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এর আগে বিলাদুল হারামাইনে অ্যামেরিকার সেনাদের উপস্থিতির কারণে, ১৯৯৬ সালে শায়খ আরেকটি ঘোষণা দেন যেখানে তিনি আলাদা করে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালে ইয়েমেনের আদেন বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত ইউ.এস.এস কোলে আল-ক্বাইদা হামলা চালায়।

৯/১১:

নব্বইয়ের দশক জুড়ে বারবার শায়খ উসামা অ্যামেরিকার উপর হামলা চালান। প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রে কিছু আঞ্চলিক উদ্দেশ্য ছিল, এবং একই সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যও ছিল। যেমন আদেনে ইউ.এস.এস কোলে হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইয়েমেন থেকে অ্যামেরিকার সেনাদের বিতাড়িত করা, এবং অ্যামেরিকাকে এই বার্তা দেয়া যে পৃথিবীর কোথাও তারা আল-ক্বাইদার কাছ থেকে নিরাপদ না। কিন্তু এসবের পাশাপাশি একটি মূল বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়েও এসব হামলা চালানো হচ্ছিল। আর তা ছিল, অ্যামেরিকাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা। শায়খ উসামা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন – অ্যামেরিকাকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে, তাদেরকে সেসব জায়গা থেকে সাময়িকভাবে বিতাড়িত করা তো সম্ভব হবে, কিন্তু তাদের সামরিক সক্ষমতাকে নষ্ট করা যাবে না। আর যতোদিন পর্যন্ত অ্যামেরিকার এই প্রবল সামরিক শক্তি ও দানবীয় অর্থনীতি বিদ্যমান থাকবে – ততোদিন অ্যামেরিকাকে হারানো যাবে না, এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ যখনই কোন জায়গায় কোন ইসলামি দল বা আন্দোলন অ্যামেরিকার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, এবং খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি করবে – তখনই অ্যামেরিকা সেটাকে আক্রমণ করে সেই দলকে বা আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেবে। একারণে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আগে প্রয়োজন অ্যামেরিকার এই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নষ্ট করা।

একারণে অ্যামেরিকার উপর প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ছিল অ্যামেরিকাকে কোন একটি মুসলিম ভূখণ্ডে টেনে আনা। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত হামলা গুলো সফল হওয়া সত্ত্বেও, শায়খ উসামা অ্যামেরিকার দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়া আশা করছিলেন, তা পাচ্ছিলেন না। বারবার মার খেয়েও অ্যামেরিকা ঠান্ডা মাথায় নিজের চাল ঠিক করছিল। একারণে দরকার ছিল এমন একটি আক্রমণ যা অ্যামেরিকাকে বাধ্য করবে আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে মুসলিম কোন একটি ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে। একই সাথে এই হামলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি জাগরণী বার্তা হিসেবে কাজ করবে যা উম্মাহর যুবকদের মনে জিহাদের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করবে। সর্বোপরি এটি হবে এমন একটি হামলা, যা সমগ্র পৃথিবীর সামনে সুপারপাওয়ার অ্যামেরিকার "অজেয়" ভাবমূর্তিকে তছনছ করে দেবে। আর এই প্রেক্ষাপটেই, এসকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়েই সংঘটিত হয় বরকতময় মঙ্গলবারের, গাযওয়াতুল ম্যানহাটন বা ৯/১১ এর হামলা।

৯/১১ হামলার মূল পরিকল্পনা শুরু হয় প্রায় ৫ বছর আগে, ১৯৯৬ এ। শায়খ খালিদ শেইখ মুহাম্মাদ ফাকাল্লাহু আশরাহ এই সময় অ্যামেরিকাতে হামলা করার জন্য প্যাসেঞ্জার বিমান ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা উপস্থাপন করেন। এ সময় শায়খ খালিদ আল-ক্বাইদার সদস্য ছিলেন এবং

শায়খ উসামার প্রতি তাঁর বাই'য়াহ ছিলো না, যদিও আল-ক্বাইদার নেটওয়ার্কের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে ৯/১১ এর আক্রমণের আগে শায়খ খালিদ, শায়খ উসামাকে বাই'য়াহ দেন এবং আল-ক্বাইদার সদস্য হন। আল-ক্বাইদার ইতিহাসে এই প্যাটার্নটি বারবার দেখা গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জামা'আর সবচেয়ে মেধাবী সদস্যদের বাছাই করে আল-ক্বাইদা নিজেদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শায়খ আবু ইয়াহিয়া আল লিব্বি রাহিমাহুল্লাহ এরকম আরেকটি উদাহরণ। জিহাদি সংঘঠনগুলোর মধ্যে আল-ক্বাইদার অবস্থান অনেকটা অক্সফোর্ডের মত। সর্বাধিক মেধাবী, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় যোদ্ধারাই কেবল এতে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পায়।

১৯৯৬ থেকেই আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শুরু হয়। মূল আক্রমণকারী টিমের সদস্য বাছাই করা হয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপদ ব্যাঙ্কিং রুট ঠিক করা হয়। আক্রমণের শেষ পর্যায়ে শায়খ উসামা নিজে টার্গেট ঠিক করেন। এ ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। আল-ক্বাইদার উচ্চ পর্যায়ের অনেক সদস্য এবং হামলার লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে জানতেন না, শুধু জানতেন অ্যামেরিকার প্রাণকেন্দ্রে বিশ্ব কাঁপিয়ে দেয়ার মতো একটি অপারেশন হতে যাচ্ছে। এমনকি আক্রমণকারী টিমের আমীররা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরাও একেবারে শেষ পর্যায়ে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে জানতে পারেন।

৯/১১ হামলার পেছনে শায়খ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিলঃ

১) অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে টেনে আনা, এবং সেখানে তাদের আটকে ফেলা। পাশাপাশি অ্যামেরিকাকে অন্যান্য আরো ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা।

২) অ্যামেরিকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়া।

৩) অ্যামেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট করে দেয়া।

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকেও মুজাহিদিনরা বিশ্লেষণ করেছিলেন কোন কোন ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে বিজয়ের সম্ভাবনা সবেচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সকল মুজাহিদিন একমত হন এ ভূখন্ডগুলো হল লিবিয়া, সোমালিয়া, আশ-শাম এবং আফগানিস্তান [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা, শায়খ আবু মুসাব আস-সুরির আল মুক্বাওয়ামা/The Global Islamic Resistance Call এ আছে, যার কিছু নির্বাচিত অংশ Inspire ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে]। একারণে শায়খ উসামা অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল খোদ আল-ক্বাইদার

ভেতরে বেশ কিছু নেতা ৯/১১ হামলার বিরুদ্ধে ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন শূরা সদস্য শায়খ সাইফ আল আদেল হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ আব্দুল্লাহ আহমেদ আব্দুল্লাহ ফাকাল্লাহু আশরাহ, সাইদ আল মাসরি রাহিমাহুল্লাহ এবং আবু হাফস আল মৌরিতানি হাফিযাহুল্লাহ। তবে মুর'জিআ পন্থী সালাফি এবং হিকমতের আতিশয্যে শয্যশায়ী হেকমতীদের মতো তাদের এই বিরোধিতা কুফফারের রক্তপাতের ইস্যুতে ছিল না। বরং তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল, ইমারাতে ইসলামিয়্যার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের শংকা। এটা নিশ্চিত ছিল ৯/১১ এর আক্রমণের পর অ্যামেরিকা তার সর্বশক্তি দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করবে। আর এর অবধারিত ফল হবে ইমারাতের পতন। এ কারণে এই শায়খগণ এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। শায়খ আবু মুসাব আস-সুরি ও তার লেখায় এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছেন এই একই কারণে। তাদের মত ছিল, এই আক্রমণের জন্য ইমারাতের পতন অনেক বেশি চড়া দাম হয়ে যায়।

কিন্তু শায়খ উসামা ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। এই আক্রমণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় কাজ করছিল। বিভিন্ন শূরা সদস্যদের বিরোধিতার পরও, তিনি তানজীমের আমীর হিসেবে এই আক্রমণের নির্দেশ দেন।

৯/১১ এর হামলা পুরো পৃথিবীর দৃশ্যপট বদলে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মুসলিম উম্মাহর যুবকদের এই হামলার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ জাগিয়ে তোলেন। এই হামলার মাধ্যমে শুরু হয় জিহাদের এক দাবানল যা ছড়িয়ে পড়ে মাগরিব থেকে মাশরিক পর্যন্ত। ৯/১১ এর আগে যে আল-ক্বাইদা এবং যে জিহাদ ছিল আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ, ৯/১১ এর পরে তা ছড়িয়ে পড়ে, সারা বিশ্বে। জ্যামিতিক হারে আল-ক্বাইদা এবং বৈশ্বিক জিহাদ বিস্তৃতি লাভ করে। শায়খ যে তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছিলেন তার প্রতিটি অর্জিত হয়।

১) অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে এক দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা আজ প্রায় ১৫ বছর ধরে চলছে। এবং অ্যামেরিকা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

একই সাথে অ্যামেরিকা ইরাকেও পরাজিত হয়েছে। আর এখন পৃথিবীর কোথাও সরাসরি মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে নিজেদের সেনা পাঠাতে অ্যামেরিকা নারাজ। যে কারনে শামে এতো কিছু ঘটে যাবার পরও অ্যামেরিকা সেখানে সেনা পাঠাচ্ছে না।

২) অ্যামেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক ধস নেমেছে, যার শুরু হয়, ২০০৭-০৮ এ। এ সময় অ্যামেরিকার জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর ২০০১ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে" অ্যামেরিকার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১.৩ ট্রিলিয়ন

ডলার। অর্থাৎ অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় সরাসরি আল-ক্বাইদার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের ফল।

৩) অ্যামেরিকার রাজনৈতিক ঐক্য আজ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। ডেমোক্রেট-রিপাবলিকান কেউই আর ক্ষুদ্র দলীয় আর ইহুদী লবির স্বার্থ ছাপিয়ে দেশের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অ্যামেরিকার জনগণ বাপকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বাল্টিমোর, অরিগন, নিউ জার্সি ইত্যাদি শহরগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলন গুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অ্যামেরিকার মানুষ আর রাষ্ট্রকে নিজেদের বন্ধু মনে করছে না। এই অবস্থায় অ্যামেরিকার সামরিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারিত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে, প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে না। এর ফলে মুজাহিদিনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সর্বোপরি জিহাদ ও খিলাফতের ডাক আজ সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। শায়খ উসামা সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পারস্য সাম্রায্যকে হারাতে হলে কি করনীয়। ধূর্ত হরমুযান পারস্য সাম্রাজ্যকে পাখির সাথে তুলনা করে বলেছিল, কোন একটি পাখাতে আক্রমণ করতে। কিন্তু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন – পাখির মাথা কেটে ফেলাই যথেষ্ট। শায়খ উসামার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা এই বিচক্ষণতার চিহ্ন খুজে পাই। শায়খ মুজাহিদিনের সীমিত সামর্থ্যকে এদিক-সেদিক আক্রমণে কাজে না লাগিয়ে, তা কাজ লাগিয়েছিলেন সাপের মাথায় আঘাত করার জন্য। আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শাইখের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। আর একারনেই আমরা এই মানহাজকে উসামার মানহাজ বলে আখ্যায়িত করছি। আল্লাহর ইচ্ছায় উসামার এই অন্যবদ্য কৌশল ছাড়া বৈশ্বিক জিহাদ হয়তো আজ এই পর্যায়ে আসতো না। হয়তো আজ আমরা বাংলাদেশে বসে বৈশ্বিক জিহাদের অংশ হতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হল এই শ্রেষ্ঠ মানহাজের অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদের তাঁর দ্বীনের সৈনিক হিসেবে কবুল করুন এবং শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেনকে আল্লাহ্ রহমতের চাদর দিয়ে জড়িয়ে রাখুন।

ইন শা আল্লাহ্ শেষ পর্বে, বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে শায়খ উসামার মানহাজের শিক্ষা এবং শামের জিহাদ থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে।